তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ঃ রুক্ষ ভূমিতে সোনালী ফসল ফলানোর গল্প

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

জাকির তালুকদারকে ধন্যবাদ একটি তথ্য সমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধের জন্য। সামগ্রিকভাবে নিবন্ধটি জাকির তালুকদারের লেখনীর মতই শক্তিশালী। আলোচক হিসাবে আমি জাকির তালুকদারের নিবন্ধের সাথে কিছু বিষয় সংযোজন করবো এবং দু/একটি ক্ষেত্রে তথ্যগত সংশোধনীর প্রস্তাব করবো।

জাকির তালুকদারের নিবন্ধের সূচনা বক্তব্যের সাথে একমত হয়েই বলতে হয়, তারাশঙ্করের লেখার ভাষায় কোনো চাকচিক্য নেই, বিশেষণের সবিশেষ প্রয়োগ নেই। বিষয়টি সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থ ভাবেই বর্ণনা করেছেন "তারাশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সোজা- কোনক্রমেই বাঁকা বা কুটিল নহে। তিনি যে সমাজে মানুষ হইয়াছিলেন, যে সমাজের মধ্যেই জীবনের বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব কাটাইয়া গিয়াছিলেন, তাহার সব খুটিনাটির সংগে তিনি বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন; এবং সোজা চোখে তাহা দেখিতেন। কোনও রকম রঙ্গ চড়াইবার উদ্দেশ্য বা আকাঙ্খা তাহার ছিল না।" এ-জন্য, তাঁকে হুমায়ুন কবির একদা নাগরিক উন্নসিকতা নিয়ে গেঁয়ো বলেছেন, তার চাইতেও অনেক বড় গঞ্জনাও তারাশঙ্করকে সইতে হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীতে তারাশঙ্কর সম্পর্কে কবিরের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে এশিয়া লেখক সম্মেলনে কবির এবং তারাশঙ্কর একই মতাদর্শে কাজ করেছেন। ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে প্রায় সকলেরই। সাহিত্য জগতে খুব সহজে অভিগম্যতা এবং স্বীকৃতি প্রাপ্তি সবসময়েই সহজ সাধ্য নয়। এক্ষেত্রে তারাশঙ্করকে যে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্য জগতে "বঙ্গসরস্বতীর খাসতালুকের প্রজা" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, সেটি বাংলা সাহিত্যেরই আরেকটি ইতিহাস। জাকির তালুকদার লিখেছেন তারাশঙ্করের লেখক জীবনের সূচনা নাটক দিয়ে। এখানে একটুখানি সংশোধনী রয়েছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ "ত্রিপত্র" প্রকাশিত হয় শ্যালক চন্দ্র নারায়ণ মূখোপাধ্যায়ের সহায়তায় ১৯২৬ সালে, লাল কালিতে ছাপা ষাট পাতার কবিতার বই। একেবারে শৈশবে আট বছর বয়সে তাঁর রচিত চতুষ্পদি কবিতাটি ছিল

" পাখির ছানা মরে গিয়েছে
মা ডেকে ফিরে গিয়েছে
মাটির তলায় দিলাম সমাধি
আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি"

যাহোক কবিতা দিয়ে যাত্রা, নাটক দিয়ে অগ্রসরতা এবং আত্ম প্রকাশ ছোট গল্পের মাধ্যমে। বিস্তৃত হয়েছেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়' বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের পরেই যার অবস্থান তিনি তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়।' একশ আটাশটি ছোট গল্প, সাতান্ন খানি উপন্যাস, কবিতা ও কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমনকাহিনী, সব মিলিয়ে এক বিস্তৃত সাহিত্য রাজ্যের অধিপতি তিনি। কিন্তু সূচনা যে কবিতা দিয়ে, তাঁর হৃদয় জুড়ে যে কাব্য, সে কাব্যের কথকতা বিস্তৃত হয়েছে ছোট গল্প, উপন্যাস সর্বোত্রই। যে কারণে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কবি পড়লে মনে হবে লেখক স্বয়ং কবির দল অথবা ঝুমুরের দল খুলে মেলায় মেলায় গেয়ে বেড়িয়েছেন, নানা জাতীয় দর্শকের সম্মুখে। কবি উপন্যাসের সবগুলো গানই তারাশঙ্করের নিজের রচিত।

'শাস্ত্রের সার কথা আরও বলে যাই ।
গো-ধন তুল্য ধন ভু-ভারতে নাই ।।
তেঁই গোলক পতি বিষ্ণু বনমালী
ব্রজধামে করলেন গব্ব র রাখালী ।।'

অথবা

'কালা যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেন?
কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে ।'

আমাদেরকে আপ্লুত করে । একজন শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের কবি হৃদয়কে আমরা উপলব্ধি করি । নিতাই চরনের কণ্ঠে তারাশঙ্কর কবি উপন্যাসে যে সর্বশেষ গানটি উপস্থাপন করেছেন

'এই খেদ আমার মনে-
ভালবেসে মিটল না সাধ, কুলাল না এ জীবনে!
হায়- জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভূবনে?'

'জীবন এত ছোট কেনে' তারাশঙ্করের এই দার্শনিক উপলব্ধি মানব ইতিহাসের সবচাইতে রুঢ়, বাস্তব এবং সম্মিলিত অভিব্যক্তিও বটে ।

তারাশঙ্করের জীবনে দুর্দান্ত প্রতিবন্ধকতা ছিল, দারিদ্রতার কষ্ট ছিল, কিন্তু প্রবলতর আত্ম বিশ্বাস এবং নিজের লেখনীর প্রতি গভীর সম্মানবোধ তাঁকে সব বাঁধা ডিঙ্গিয়ে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সম্রাটের আসনে সমাশীন করেছে । জাকির তালুকদার এ বিষয়গুলো যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন । তবে জাকির তালুকদারের সাথে কিছুটা দ্বিমত প্রকাশ করে বলতে চাই তিনি বিলম্বে হলেও স্বীকৃতি পেয়েছেন আবার প্রারম্ভিক পর্যায়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি নি:সন্দেহে তথাকথিত সকল বুদ্ধিজীবির উন্নাসিকতাকে অনায়াসেই ডিঙ্গিয়ে গেছে । আরেকজনের কথা বলতেই হয় মোহিতলাল মজুমদার, যিনি তারাশঙ্করের মর্মবেদনার জ্বালায় অনবদ্ধ প্রলেপ মাখিয়েছেন । মোহিতলাল লিখেছিলেন 'গল্প লেখকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান কে, এই প্রশ্নের উত্তরোত্তর স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার দাবিই গ্রাহ্য হইতে পারে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করিবার দু:সাহস আমি করিতেছি । মোহিতলাল আরও বললেন, 'বস্তুর বাস্তবতাকেই গ্রাহ্য করিয়া তাহার রসরূপ আবিস্কার করায় যে কবি-মনোভাব, তাহার একটি অভিনব মৌলিক ভঙ্গী তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে ।'

মোহিতলালের এই উচ্ছুসিত প্রশংসায় তারাশঙ্কর সেদিন কিভাবে অভিভূত হয়েছিলেন তার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'আমি সেদিন ওই বারান্দায় শুয়ে ওই কাগজখানার উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তারপর । গাঢ় সে ঘুম । এমনভাবে একটি মর্মান্তিক বেদনা ও ক্ষোভ কয়েক মিনিটের মধ্যে মুছে যেতে পারে-এ জানতাম না সেদিনের আগে ।'

এই উৎসাহ তারাশঙ্করকে ঘোর অমাবশ্যায় পথ চলার আলো দেখিয়েছে, যে আলোয় তিনি হেঁটেছেন এবং আলোকিত করেছেন আমাদের সবাইকে । তারাশঙ্কর তাঁর ব্যাক্তিগত জীবনে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার (ভূস্বামী?) পরিবারের সন্তান ছিলেন, শৈশবে পিতৃহারা হয়েছেন, মেট্রিকুলেশন পাশ করেছেন, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হতে কলকাতা এসেছেন, অসুস্থ হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দেশে ফিরে গেছেন, রোগমুক্তির পর আবার সাউথ সুবারবান কলেজে (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) পুনরায় ভর্তি হয়েছেন, বিপ্লবিদের সাথে সম্পর্কের কারণে কলকাতা থেকে পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখেই পুলিশের চাপে ফিরে যেতে হয়েছে স্বগ্রামে । বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

হয়েছেন, আয়-রোজগারের জন্য ব্যবসা করার চেষ্টা করেছেন, চাকরি করে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করেছেন যদিও এগুলোতে তাঁর আকর্ষণ ছিলনা। এ সময় তিনি নাটক রচনা করেছেন, নাটকে অভিনয় করেছেন, স্বনামে বেনামে নিজ গ্রাম লাভপুর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা পূর্ণিমাতে লেখালেখি করেছেন। এভাবে খুব কাছ থেকে রাঢ়অঞ্চলকে গভীর ভালবাসার সাথে পর্যবেক্ষণ করেছেন, সাহিত্য সেবার সাথে সাথে দেশ সেবা, সমাজসেবা, জনসেবাও করেছেন। প্রতিনিয়ত জমিদার দেখেছেন, একাত্ব হয়েছেন চাষী, প্রজা, কৃষাণ ও শ্রমজীবিদের সাথে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও হয়েছেন একসময়। কংগ্রেসের আহবানে, গান্ধিজির আদর্শে আইন অমান্য আন্দোলনে মিশে যেয়ে কারাবরণ করেছেন। এই যে একান্ত কাছ থেকে গ্রামীণ বাংলাদেশের জীবন ও যাপন, ক্ষমতা কাঠামো, উত্থান-পতন, সুখ-দু:খ, শুভ ও নষ্ট দৃষ্টি, লোভ-আকাঙ্খা ও পরিণতি দেখেছেন তার উপরে ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে তারাশঙ্কর অসামান্য কথাসাহিত্যিকে পরিণত হয়েছেন, যে কারণে তারাশঙ্করের কাহিনী এবং মানবচরিত্র চিত্রন কোন আরোপিত ঘটনা নয় এগুলো বাংলার গ্রাম থেকে উঠে আসা জীবন্ত চরিত্র। জাতি হিসেবে নির্মম বাস্তবতাকে সরাসরি মেনে নেয়ার যে দূর্বলতা আমাদের রয়েছে সে দূর্বলতার কারণেই তারাশঙ্করকে সূচনা পর্যায়ে এমনকি প্রতিষ্ঠার মধ্যম পর্যায় পর্যন্ত মেনে নিতে আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের অনেকক্ষেত্রেই হোঁচট খেতে হয়েছে। বাস্তবতার সাথে প্রলেপ মাখিয়ে রঙিন চলচ্চিত্র সাময়িকভাবে পাঠক বা দর্শককে মুগ্ধ করতে পারে সত্য, কিন্তু সত্যের যে সৌন্দর্য্য তা বিঘ্নিত হয়। এখানেই তারাশঙ্করের সাথে অন্যদের পার্থক্য। তারাশঙ্কর সত্যের সৌন্দর্য্য তুলে ধরেছেন, নিপূণ লেখনীতে এবং যার মাধ্যমে তার লেখনী পরিণত হয়েছে সমকালীন থেকে চিরকালীনে। তারাশঙ্কর নির্ভীক দৃষ্টি মেলে জীবনকে দেখেছেন সামগ্রিক রূপে। মানিক বন্দোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রও অনেক দেখেছেন। বীভৎসতা মানিককে বীতরাগ করেনি। তারাশঙ্কর আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে এলেন। বীভৎসতা নিরাপদ রইল না, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। 'নারী ও নাগিনী' 'তারিণী মাঝি' 'আখড়াইএর দীঘি' 'তিনশূন্য' ইত্যাদি গল্পে যে ভয়ঙ্করকে দেখলাম, প্রচুর উপন্যাসের মধ্যে দেখা দিল সে। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' 'হাসুলী বাঁকের উপকথা' 'কালিন্দী' সর্বত্র মধ্যে মধ্যে পদক্ষেপ ভয়ঙ্করের। আগাগোড়া তারাশঙ্করীয় রচনায় উপস্থিত ভীতি ও ভাবনা। 'তাসের ঘরে'র মত গল্প, 'রাইকমলে'র মত বৈষ্ণবীর উপন্যাস পড়ে যে স্বস্তি বা আনন্দ জাগে, তারাশঙ্করের অধিকাংশ রচনায় তা অনুপস্থিত। তারাশঙ্কর জৈবিক প্রয়োজনে মানুষের নিষ্ঠুরতম মুর্তির স্বরূপ বহুবার উদঘাটন করেছেন। 'তারিণী মাঝি'তে দেহে জীবন রাখার প্রয়োজনে তারিণী প্রেয়সী পত্নী মুখীকে জলে ডুবতে দিয়ে নিজেকে তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নিল। মনের থেকে দেহ অনেক ক্ষেত্রে প্রবল তারাশঙ্করে, তাই অপার্থিব ইন্দ্রধনু তাঁর প্রেমগগনে সর্বদা উদয় হয়নি। তারাশঙ্কর নিজেও বলতেন"আমি রেঢ়ো মামুন, আমি কারুকে ভয় পাই না।"

তারাশঙ্করের সন্দিপন পাঠশালা ব্যক্তিগতভাবে আমার সবচাইতে পছন্দের উপন্যাস। এই উপন্যাসে তারাশঙ্করের লেখনীকে একটি নির্দিষ্ট সময় ও কালের যে চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। সন্দিপন পাঠশালা নিয়ে কয়েকটি কথা আলোচনা করছি। তেরশ বায়ান্ন সালে দৈনিক কৃষক পত্রিকার শারদিয়া সংখ্যায় উদয়াস্ত নামে প্রকাশিত উপন্যাসটি বই হিসেবে বের হওয়ার সময় তিনি এটির নাম রাখলেন সন্দিপন পাঠশালা। সন্দিপন পাঠশালার চিত্ররূপ প্রদর্শন কালে ১০ই এপ্রিল ১৯৪৯ সালে হাওড়ার একটি সভা থেকে ফেরার পথে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁর উপরে আক্রমন চালান। সীতারাম পন্ডিতের কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন সরল বাস্তবতায় 'সীতারামের খাতায় ধীরাবাবুর উদ্দেশে লেখা অনুরোধের ঢংএ। - "তবে যেন মিথ্যে রঙ-চঙ চড়াবেন না। একতারায় যেমন সুর ওঠে তেমনি বাজাবেন। বাউলের গান যেমন হয় তেমনই রাখবেন। একরঙা ছবি যেমন লাগুক, দোসরা রংয়ের আঁচড় দেবেন না।"

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে চতুর্থ দশকের শেষ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছরের বাংলার জনজীবনের এক অসাধারণ চালচিত্র তারাশঙ্করের সন্দীপন পাঠশালা। সন্দীপন পাঠশালার মূল চরিত্র সীতারাম পন্ডিত এবং তার জীবনযুদ্ধ এক আলোকিত মানুষের আঁধার কেটে আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের গল্প। যে সময়কালের ক্যানভাসে সন্দীপন পাঠশালার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, সে সময়কাল বাংলার জনজীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়–প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত কাল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণ, অবশেষে দেশভাগ ও ভারতের স্বাধীনতা।

এই সময়কালকে উপজীব্য করে একটি আধা মফস্বল অঞ্চলের জীবন ও যাপনের যে রোজনামচা তারাশঙ্কর বর্ণনা করেছেন তার থেকে ছয় দশক পরে এসেও সমাজবাস্তবতার চিত্র সমসাময়িক বলেই প্রতীয়মান হয়। সন্দীপন পাঠশালা সীতারামের যাপিত জীবনের যুদ্ধ, যে যুদ্ধ শুধু তার ব্যক্তিগত নয়, একটি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ক্লেদাক্ত অবস্থার পরিবর্তনেরও যুদ্ধ। যে যুদ্ধের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে বাংলার গ্রামীণ জনজীবনের সমাজবাস্তবতা। তারাশঙ্কর নির্মোহ দৃষ্টিতে বর্ণনা করেছেন সীতারাম পন্ডিতের জীবনযুদ্ধ।

সীতারাম মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের সন্তান। গ্রামীণ জনজীবনে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের সন্তানদের বিদ্যালয়ে গমনের প্রচলন ছিল। তারাশঙ্কর যেটিকে বর্ণনা করেছেন 'কালের রেওয়াজ' হিসেবে। সে রেওয়াজ অনুযায়ী সীতারামও স্থানীয় হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজির প্রতি ভীতি তাকে লেখাপড়া সমাপ্ত করতে দেয়নি, নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েও দুবার চেষ্টা করেও ফেল করে বাড়ি ফিরেছে। একদা তার ভেতরে স্বপ্ন ছিল চাষার চরিত্র পরিবর্তন করে চাকুরে বাবু হবে। যদিও সীতারামের বাবা রমানাথ এ বিষয়ে একমত ছিলেন না। তারাশঙ্করের ভাষায় রমানাথ বিশ্বাস করতেন 'আমরা চাষী, ছিস্টি থেকে পিতিপুরুষের কুলকম্ম হল চাষ। এই চাষ করেই আমরা খেয়ে-পরে ছেলেপুলেকে জমিজমা দিয়ে হরি বলে চোখ বুজে আসছি।' এতো শুধু রমানাথের বিশ্বাস নয়, মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থের এই বিশ্বাস ছিল বাংলার সর্বত্র। কিন্তু সীতারামের চাকুরে বাবু হওয়ার উচ্চাকাঙ্খা-মুলত কৃষক পরিবারের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে পরিণত হওয়ার যে ধারা বিংশ শতাব্দীর শুরু তে সূচিত হয়েছিল, সেই ধারার নির্দেশক।

তারাশঙ্করের সন্দীপন পাঠশালায় কালের রেওয়াজ অনুযায়ী কৃষক পরিবারের সন্তানদের ইংরেজি বিদ্যালয়ে পঠনের বিষয়টি প্রমাণিত হয় অপর্ণা বসুর 'The Growth Education and Political Development in India 1898-1920' গ্রন্থে। বসু উল্লেখ করেছেন, ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯২০ সালের ভেতর বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি সূচিত হয়। বেসরকারি হাইস্কুল ও কলেজেই তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ভারতের সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলায় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে সর্বোচ্চ-সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী কলা বিষয়সমূহে পড়াশুনা শুরু করে। ১৯০২ সাল নাগাদ সমগ্র ভারতের কলেজসমূহে অধ্যয়নরত কলা বিষয়গুলির মোট ছাত্র-ছাত্রীর প্রায় অর্ধেক বাংলা প্রদেশেই ছিল। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সালের ভেতর গোটা ভারতের কলেজে যেখানে ১০১৯৫ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি পেয়েছে, বাংলার উভয় অঞ্চলের কলেজে তার ভেতর বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৩১৮ জন। বাংলায় ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যেও কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ৯৭১৬ থেকে ১৮৪৭৮ এ পৌঁছায়। মাধ্যমিক স্তরেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯০১-০২ সালে সমগ্র ভারতে যেখানে ৩০৯৭টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল, সেখানে বাংলায় ছিল মোট ১৪৮১টি স্কুল। বাংলার প্রতি জেলায় গড়ে ৩০টি করে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল, যেখানে মাদ্রাজে ২০টি, বোম্বেতে ১৭টি এবং উত্তর প্রদেশে ৪টি স্কুল ছিল।

একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ গঠনের যে ধারাবাহিকতা পুরো বাংলা জুড়ে শুরু হয়েছিল তার প্রভাব সীতারামের গ্রামে এবং সীতারামের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল অনায়াসে। কেননা, এই গ্রাম থেকে কয়েকজন ইতিমধ্যে সফলতা অর্জন করেছিল। যারা ছিল সীতারামের রোল মডেলও বটে। এদের কেউ কেউ যেমন সদগোপ পাড়ার মাতব্বর রঙ্গলালের দুই ছেলের সাফল্যে চাষীদের গ্রামে এক নতুন উৎসাহে আশায় বুক বেঁধে ছিল। তাছাড়া রত্নহাটা স্কুলের তরু ণ সদগোপ শিক্ষক যিনি অনায়াসে ব্রাহ্মণদের সাথে মিশে যেতেন তিনিও ছিলেন সদগোপদের একটি আদর্শ।

তারাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর শক্তিশালী লেখনিতে বাংলার গ্রামের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা সত্যিই অসাধারণ 'তের শো সালের চাষীদের গ্রাম। তাদের পাড়ার প্রান্তে বাউরীদের পল্লী। মন্ডল মহাশয়দের চাষকর্মে তারা কৃষানি মান্দেরি করে, গো-পালনে তাদের সাহায্য করে। ভোর রাত্রে কর্তা ওঠার পূর্বেই তারা বাড়িতে এসে হাজির হয়। কর্তা নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন, তারা গরু গুলিকে গোয়াল থেকে বাইরে এনে খেতে দেয়। কর্তা তামাক সেজে তামাক খান, গরু গুলির গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করেন, তিরস্কার করেন, শাসন করেন। আবার রাত্রিতে কাজের শেষ করেন গো-সেবা করে। গোয়ালে ধোঁয়া দিয়ে মশা-মাছি তাড়িয়ে গরু গুলিকে আপন আপন স্থানে বেঁধে দেন। কেউ জায়গা ভুল করলে তিরস্কার করে বলেন–বেকুর–বেহদ্দ-বদমাশ কোথাকার, নিজের জায়গা চেন না? তারপর তামাক খেতে খেতে স্মরণ করেন দয়াময় হরিকে।

মাটির ঘর, খড়ের চাল, বাঁশ অথবা কাঠের আটচালা খুঁটি দেওয়া, আলকাতরা মাখানো দরজা, রাঙা মাটিতে নিপানো দেওয়াল; তার উপর খড়ি ও গিরিমাটির আঁকা আলপনা, গোবরে-মাটিতে লেপা মেঝে এবং উঠান, এই নিয়ে তাদের ঘর। কারও কারও ঘর কোঠা অর্থাৎ দোতলা; অধিকাংশ ঘর কোঠা নয় অর্থাৎ একতলা। বাড়ির পাশে খিড়কি ডোবা, ডোবায় কাঠের গুড়ি দিয়ে ঘাট, সেই ঘাটে বসে চাষী বউয়েরা বাসন মাজে, কলমি-সুষনির দল থেকে শাক তোলে, পুরু ষেরা পলুই ফেলে নিত্যকার মাছ সংগ্রহ করে।

ডোবার চারিপাশে সবজির ঘরু টে ক্ষেত, শাকের আড়া, লাউ-কুমড়োর মাচা, তারই মধ্যে মাঝে জাফরি-ঢাকা দুটি একটি ভাল জাতের আমের চারা, এ ছাড়া পেঁপে গাছ, জবা-করবীর গাছ আছে, ঘন সবুজ ফ্রেমের মত ডোবার জলটুকুকে ঘিরে থাকে। জবা-করবী গাছের ফুল তুলে ওরা নিজেরাই দেবস্থানে দিয়ে আসে, ফল-শাকও দিয়ে আসে, তাতে বিধিনির্দেশে মৃত্তিকা পরিচর্যার জন্য নিয়োজিত ওদের হাত দুখানি ধন্য হয়ে যায়। বাড়ির অন্য দিকে খামার এবং গোয়াল; এই দিকটাই ওদের বাড়ির সদর, জমিদারের যেমন কাছারি, বাবুলোকের যেমন বৈঠকখানা, ওদের তেমনি খামার গোয়াল। একটা প্রশস্ত চালা, চালার সামনে অনাবৃত খামারে ধান, খড়, মরাই, গোয়ালের ঘরগুলির সামনে পরিচ্ছন্ন পরিপাটি করে মাটি দিয়ে বাঁধানো ডোবার সামনে গরু গুলি সারি সারি বাঁধা থাকে। প্রশস্ত চালাটার মাচায় তোলা থাকে চাষের সামগ্রী-লাঙল, জোয়াল, দুনি, দড়ি; এমন কি দুনি ব্যবহারের 'একা কাঠ' এবং লম্বা বাঁশটি পর্যন্ত তোলা থাকে।

সবল পেশীবহুল দেহ; মাথার চুল কদমফুলি ছাঁটে ছাঁটা, তার মাঝখানে টিকি, গলায় তুলসীকাঠের মালা, পুরু ষদের পোশাক সাত হাত লম্বা দু হাত চওড়া-তাঁতে বোনা মোটা কাপড়, কাঁধে গামছা; মেয়েদের পোশাক ন হাত বিয়াল্লিশ ইঞ্চি ওই তাঁতেরই শাড়ি; ভোরে-উঠে পুরু ষেরা যায় মাঠে, মেয়েরা গৃহকর্ম করে, গোসেবা করে, তার পর এক প্রহর বেলার পর রান্না চড়ায়, খাওয়া দাওয়া হতে দু প্রহর গড়িয়ে শেষ হয়ে যায়, বাবুদের গ্রাম রত্নহাটার ইস্কুলে তখন ঢং ঢং করে টিফিনের পর ইস্কুল বসার ঘণ্টা বাজে। ছেলেরা দশ বারো বৎসর

পর্যন্ত গাঁয়ের পুরু তমশায়ের পাঠশালায় লেখাপড়া শেষে, তার পর পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করে কর্তাদের সঙ্গে চাষের কাজে লাগে। ওরা জীবনে বেশি লেখাপড়ার প্রয়োজন অনুভব করে না। কি প্রয়োজন? ক্ষেতের ফসল, পুকুরের মাছ, ঘরের দুধ, ঘরের গুড় পরিতৃপ্তি সহকারে পেট পুরে খায়, ভগবানকে স্মরণ করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ক্ষেতে পরিশ্রম করে, ক্ষেতের ফসল ফুলে ফলে ভরে ওঠে, ওদের জীবনও ভরে ওঠে অপরিসীম আনন্দে।

তারাশঙ্কর যে গ্রামীণ জনজীবনের বর্ণনা দিযেছেন সে গ্রামীণ জীবন নিঃসন্দেহে একটি সমৃদ্ধ, নিস্তরঙ্গ ও স্বয়ম্ভর গ্রাম। চাষীদের গ্রামের এমন চিত্রের প্রমাণ মিলে ফ্রান্সিস বুকাননের বর্ণনায়। বুকানন ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তাকে ১৮০৭ সালে বাংলার বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করে স্থানীয় ইতিহাস প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৮৩৩ সালে বুকানন বৃহত্তর দিনাজপুর জেলায় জীবন যাত্রার উপর একটি ভৌগোলিক ও পরিসংখ্যানগত বিবরণ উপস্থাপন করেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন.... এই অঞ্চলে ছাত্ররা সাধারণত পাঁচ বছর বয়স থেকেই স্কুলে পড়তে যায়। এর পরেই তারা তাল বা কলাপাতার উপর অংক করতে শুরু করে। একই সাথে তারা গণনা করা আর জিনিসপত্রের ওজন ও মাপ শিখে। এর পর তারা হিসাব করতে শিখে এবং এদেশের গণিত বিদ্যার যে সকল নিয়ম-কানুন আছে যেমন ঃ যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ তা করতে শিখে। পাঠশালাগুলোতে সাধারণত এ ধরনের গণিত বিদ্যাই শিখানো হয়। এই গণিত বিদ্যা জমিজমা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব রাখার কাজে লাগে।

তারাশঙ্কর সন্দীপন পাঠশালায় যে ভয়াবহ জাত প্রথা ও সামাজিক শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন তা পাঠক মাত্রেরই গভীর বেদনার জন্ম দেয়। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা আধা শহর রত্নহাটায় বসবাস করতেন। তারা জাতিগতভাবে ব্রাহ্মণ ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। আধা শহর রত্নহাটার বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর এভাবে-'সাবরেজিষ্ট্রি আপিস, পোষ্ট-আপিস, থানা আছে, এমন কি একজন সার্কেল ডেপুটি পর্যন্ত এখানে তাঁর হেড কোয়ার্টার করেছেন। স্কুল, বোর্ডিং, গার্লস স্কুল আছে, লাইব্রেরি আছে, অ্যামেচার থিয়েটার আছে, মহিলা-সমিতি আছে, এমন কি সাহিত্য সভা পর্যন্ত আছে। ফুটবল মেচ খেলার জন্য একটা কাপ পর্যন্ত রয়েছে।'

এমন একটি আধা শহরে বাবুরা বসবাস করেন। তাঁরা বহিরঙ্গে বাবু হলেও হৃদয়টি একেবারেই অন্ধকার। চাষীসহ অন্যান্য শ্রেণী পেশার তথা নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মানুষ হিসাবেই জ্ঞান করেন না। মণিলাল বাবু অনায়াসে সীতারামকে আদেশ দিতে কুণ্ঠবোধ করেন না সে চাষীর ছেলে বলে। সীতারাম যখন সাহাপাড়ায় পাঠশালা করার কাজ শুরু করে তখন শিবকিঙ্কর প্রচন্ড তাচ্ছিল্য করে অনায়াসে বলে ফেলে, চাষা চাষা, অ্যাঁ চাষা পন্ডিত হয়েছে। শুধু তাই নয় তার চেয়েও শ্লেষযুক্ত ভাষায় উচ্চারণ করে 'হে-হে-হে-হে। চাষা পন্ডিত অ্যান্ড শৌন্ডিক ছাত্র। কাগজং কলমং করচং মাত্র।' এমন ভয়াবহ অপমানেই বিষয়টি থেমে থাকেনি। যদিও এই চরম উন্নাসিকতার ফলাফল হিসাবে জ্যোতিষ সাহা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সীতারামকে দিয়ে পাঠশালা খোলার। পাঠশালা শুরুর পূর্ব মূহূর্তে এসব তথাকথিত উচ্চবর্ণীয় ভদ্র সন্তানেরা (?) পাঠশালা প্রাঙ্গণ কদর্যভাবে নোংরা করে রেখেছে। উচ্ছিষ্ট শালপাতা, মাংসের অবশিষ্ট, হাড়ের টুকরা ছড়িয়ে রেখেছে। পুরো সাদা দেওয়াল জুড়ে লিখেছে চাষা-চাষা-চাষা, শুঁড়ি- শুঁড়ি- শুঁড়ি। চূড়ান্ত অপমানের জন্য একটি সংস্কৃত শ্লোকও লিখেছে অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে যদি বা–দোলায়ং যাতে-ন চাষা সজ্জনায়তেন। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের কোন ভাবেই সীতারামের এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠা মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। এটি যতটা না ধর্মীয় ব্যবধান তার চাইতে অনেক বেশি সামাজিক শোষণের মানসিকতা থেকেই। যে কারণে সীতারামকে কেউই সহযোগিতা করেনি,

কেবলমাত্র রাণী মা ও ধীরানন্দ ছাড়া। পাঠশালা প্রতিষ্ঠার পরও নানাভাবে চেষ্টা করেছে পাঠশালাকে বন্ধ করার। ধীরানান্দের অসহযোগ আন্দোলনের কারণে গ্রেফতারের খবর পেয়ে সীতারাম পাঠশালা ছুটি দিয়েছিল। এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন বাবু সাহেবরা। মণিশঙ্কর বাবু সাব-ইন্সপেক্টরের কাছে অভিযোগ পত্র দিয়েছেন, তাতেও কিছু না হলে পুলিশ দিয়ে পাঠশালা বন্ধ পর্যন্ত করেছেন।

সমাজের উঁচু তলার মানুষের এই হৃদয়হীন আচরণ তারাশঙ্কর তুলে ধরেছেন সাবলীলভাবে। এই সমাজ বাস্তবতা সাধারণ তৃণমূলের মানুষকেও এক সময় মোহভঙ্গ করেছে। তারাশঙ্করের ভাষায় 'রত্নহাটার এই সব বাবুদের দেখে আর তার মনে পূর্বেকার মত বিস্ময় জাগে না। সে বিস্ময় আর ভয়ে কোন প্রভেদ নাই। সে ভেবে দেখেছে, ভক্তি আর ভয়ে মিশে এমনটা হয়। ...আর ভয়? কিসের ভয়? ভয়ও আর তার হয়না। একটা জিনিস সে বুঝেছে। এরা হুঙ্কার করে উঠবেই, ওটা তাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। হুঙ্কারের পিছনে আছে দু-চারটে চাপরাসী। সাহস করে হুঙ্কারকে আগ্রহ্য করে দাঁড়াতে পারলে ওরা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আর ভয়ই বা করবে কেন? ওরাও মানুষ, আর সবাইও মানুষ।' ধীরানন্দ সন্দীপন পাঠশালার এক উজ্জ্বল চরিত্র। তথাকথিত ভদ্রলোক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও ধীরানন্দ, রাণী মা সমাজ পরিবর্তনের উজ্জ্বল সারথি। ধীরানন্দই সীতারামকে পাঠশালার নাম ঠিক করে দিয়েছিল সন্দীপন পাঠশালা। সন্দীপন মুনির পাঠশালায় শ্রীকৃষ্ণ লেখাপড়া শিখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অন্যায় ও অবিচার প্রতিরোধের প্রতীক। তারাশঙ্কর সন্দীপন পাঠশালায় নিপুণ হাতে তুলে এনেছেন সমাজ বাস্তবতাকে। বাঙালি সমাজ জীবনে প্রবল ভাবে উপকৃতের তার চেয়েও ততোধিকভাবে অস্বীকারের যে প্রবণতা তা সন্দীপন পাঠশালার জয়ধর চরিত্রে প্রমাণিত। বাবুদের বাড়ীর ঝিয়ের ছেলে জয়ধরকে আস্তাকুঁড় থেকে তুলে এনে সীতারাম পন্ডিত নিজ উদ্যোগে ও চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়েছেন। জয়ধর যখন বিএতে পড়ে তখন একদিন সীতারাম তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু অকৃতজ্ঞ জয়ধরের উত্তর ছিল 'অনেক পন্ডিত অনেক মাষ্টারের কাছেই পড়লাম-সকলের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করতে হলে-পা ক্ষয়ে আধখানা হবে, মাথা ঠুকে ঠুকে আব হবে কপালে।' বাংলাদেশের সমাজ জীবনে অসংখ্য জয়ধরের চরিত্র প্রতিনিয়ত সমাজকে অস্থির করে তুলছে, বিবর্ণ করে তুলছে ভাল থাকার সব বোধগুলোকে। জয়ধরের চরিত্রের সংখ্যাধিক্যের কারণে আমাদের যাপিত জীবন প্রতিনিয়ত দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের অসাধারণ লেখনীতে জয়ধরের চরিত্র যেন বাস্তবে উঠে এসেছে।

সামগ্রিকভাবে সন্দীপন পাঠশালা তারাশঙ্করের এক অসাধারণ সৃষ্টি, যেখানে সমাজ বাস্তবতা প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশকে নতুন ভাবে অস্তিত্বের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। পেশা ও শ্রেণী বিভাজন, সমাজ কাঠামোতে শ্রেণীর দ্বন্দ্ব, উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি বাঁক সন্দীপন পাঠশালার মূল উপজীব্য।

তারাশঙ্করকে অনেক ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে যেতে হয়েছে সত্য কিন্তু চূড়ান্ত অর্থে তিনি জীবিত অবস্থায় স্বীকৃতি পেয়েছেন, অন্তত:পক্ষে বাঙালী জীবনে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। ভারতের স্বাধীনতার পর যাদবপুর, কলকাতা ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করেছে। রবীন্দ্র, আকাদেমী, শরৎচন্দ্র স্মৃতি পদক, জ্ঞানপিঠ ও জগত্তারিণী পদক, পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ, আট বৎসর পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের ও ছয় বৎসর রাজ্যসভার সদস্য, আকাদেমীর ফেলোশিপ সবই তিনি পেয়েছেন, সেক্ষেত্রে তারাশঙ্করকে কিছুটা ভাগ্যবান বলতেই হবে, তবে তাঁর মৃত্যুর পর সে অর্থে তারাশঙ্করের মূল্যায়ন হয়নি বলেই মনে হয়। তারাশঙ্করের জন্ম অথবা মৃত্যুবার্ষিকী সে অর্থে পালিত হয় না বাংলা ভাষার রাজধানী ঢাকায় অথবা

তারাশঙ্করের প্রিয় শহর কলকাতায়, আলোচনা হয় না গণমাধ্যমে কিংবা আকাশ মাধ্যমেও। এটি দু:খজনক শুধু নয় বরং বাঙালী হিসেবে আমাদের আত্মপ্রবঞ্চকতার যে তকমা রয়েছে, সেটিকেই প্রমাণিত করে।

বাংলাদেশের সাথে তারাশঙ্করের একটি নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ৪৭'র দেশ বিভাগের পর ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মহাসম্মেলনে এসেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। সেটি যতটা না সাংবাদিক হিসেবে তার চাইতে অনেক বেশি প্রাণের টানে। প্রাণের টানে যে তারাশঙ্কর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন তার অসাধারণ সাক্ষর মেলে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) বাঙালীদের উপর পাকিস্তানীদের বর্বর অত্যাচারের নির্মম বাস্তবতার শোচনীয় চিত্র 'একটি কালো মেয়ের গল্পে' । এই গল্পটি মূলত: একটি মেয়ের জীবনকে কেন্দ্র করে নরপশু ইয়াহিয়ার নরমেধ জজ্ঞের অবিকল প্রতিলিপি। পূর্ব বাংলা যে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ ছিল বঙ্গবন্ধুর এই ধারনাকে তারাশঙ্কর একটি কালো মেয়ের গল্পে রূপায়িত করেছেন, গভীর মমত্ববোধের সাথে সমর্থন করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে। মনে রাখতে হবে, এটি তারাশঙ্করের জীবনের একেবারেই শেষ অধ্যায়ের ঘটনা। গভীর দু:খের সাথে বলতে হয়, সমরেশ বসুর মত অনেক উচুঁ মাপের সাহিত্যিক যাদের সাথে ঢাকার নাড়ির সম্পর্ক ছিল তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সে অর্থে সমর্থন করেননি, কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রায় দাঁড়িয়েও তারাশঙ্কর পূর্ববঙ্গের মানুষের মুক্তি চেয়েছেন। শুধু মুক্তি চাননি মুক্তি সংগ্রামের অংশ হয়েছেন। এখানেই তারাশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গী এবং ঋজ ভয়শূন্যচিত্ত যা মেহনতি মানুষের পক্ষের জয়গান হয়ে বিস্তৃত হয়েছে পুরো বাংলা সাহিত্যে- সেখানে সাঁওতাল বিদ্রোহ যেমন এসেছে, বাংলার মনন্তর যেমন এসেছে, একইভাবে এসেছে অন্তজ শ্রেণীর সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, বাউরি, ডোম, গ্রাম্য কবিয়াল সম্প্রদায়ের কথা। ১৯৭১ সালের আগষ্টের শেষে তিনি মস্তিস্কের রক্তক্ষরনজনিত ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর চির বিদায় নেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমার লিখেছেন, 'তাঁর লুপ্তচেতন দেহ থেকে তাঁর প্রাণের শেষ নিষ্ক্রমণ হতে বেশ সময় লেগেছিল। কারণ তাঁর হার্ট শেষ পর্যন্ত নাকি পঁচিশ বৎসরের তরুণের মতো বলবান ও সক্রিয় ছিল।' যে সিংহ হৃদয় নিয়ে তিনি সারা জীবন অতিক্রম করেছেন সেখানে হৃদয় শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী থাকাটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয়, বিলম্বে হলেও গত বিজয় দিবসে বাংলাদেশের জাতীয় সম্মাননা পেয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়।

পরিশেষে কবি কালিদাস রায়ের রচিত তারাশঙ্করের জন্মদিন উপলক্ষে প্রশস্তি গাঁথা দিয়েই শেষ করছি। কালিদাসের তারাশঙ্কর সম্পর্কে উপলব্ধি বাঙালী জীবন মাত্রই সবসময় এবং কালের উপলব্ধিও বটে-

'একদা সরস ছিল যে রাঢ়ের মাটি
সারা দেশ তায় পেয়েছিল রস খাঁটি।
শুকায়ে উষর সে মাটি হইল ক্রমে,
এবে জীবন্ত কঙ্কাল তায় ভ্রমে
সে মাটিতে পুন নব রস সন্ধান
পাইয়াছ তুমি হে গুণি ভাগ্যবান্।
সেই রসধারা বিলালে গৌড় জনে,
তোমার বাণীতে ফিরে পাই হারাধনে।
ও মাটির খাঁটি মালিক যাদের জানি,
শুনি ও কণ্ঠে তাদের প্রাণের বাণী।...'

সবাইকে ধন্যবাদ